

প্রথম অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশ



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-লার্নিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-সার্ভিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-কমার্সের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সামাজিক যোগাযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিনোদনের ক্ষেত্রে আইসিটির ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব এবং
- 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ' বিষয়ক একটি পোস্টার ডিজাইন করতে পারব।

একুশ শতক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বিগত শতাব্দীতে সম্পদের যে ধারণা ছিল, একুশ শতকে এসে সেটি পুরোপুরি পাণ্টে গেছে। পৃথিবীর সবাই মেনে নিয়েছে যে, একুশ শতকের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। যার অর্থ কৃষি, খনিজ সম্পদ কিংবা শক্তির উৎস নয়, শিল্প কিংবা বাণিজ্যও নয়— এখন পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তার কারণ শুধু মানুষই জ্ঞান অন্বেষণ করতে পারে, জ্ঞান ধারণ করতে পারে এবং জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। পৃথিবীর সম্পদের এই নতুন ধারণাটি সারা পৃথিবীতেই মানুষের চিন্তাভাবনার জগতটি পাণ্টে দিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ এখন একুশ শতকের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

আমরা সবাই অনুভব করতে পারছি একুশ শতকের পৃথিবীটা আসলে জ্ঞানভিত্তিক একটা অর্থনীতির ওপর দাঁড়াতে শুরু করেছে। একুশ শতকে এসে আমরা আরো দুটি বিষয় শুরু করেছি— যার একটি হচ্ছে Globalization, অন্যটি হচ্ছে Internationalization। এই দুটি বিষয় ভূরাজি হওয়ার পেছনের কারণটি হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। যেকোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানা বিশ্বায়নের কারণে নিজের দেশের গতি ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটি বোঝার জন্যে আমরা আমাদের বাংলাদেশের উদাহরণটিই নিতে পারি। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে— তারা যে যেখানে আছে সেই অংশটুকুই বাংলাদেশ। এক অর্থে বাংলাদেশের সীমানা ছড়িয়ে গেছে! আবার বাংলাদেশের অধিবাসী হয়েও তারা পৃথিবীর অন্য দেশের নাগরিক হয়ে বেঁচে আছে, আন্তর্জাতিকতা এখন এই নতুন পৃথিবীর অগিষিত নিয়ম।

আমরা জ্ঞান, পৃথিবীর মানুষকে এক সময় বেঁচে থাকার জন্যে পুরোপুরি প্রকৃতির অনুকূল্য ওপর নির্ভর করতে হতো। মানুষ বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনেছে। অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর মানুষ যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। পৃথিবীর যে সকল জাতি শিল্প বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল, এক সময় তারাই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একুশ শতকে যখন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা হয়েছে, তখন আবার সেই একই ব্যাপার ঘটছে। যারা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করার বিপ্লবে অংশ নেবে তারাই পৃথিবীর চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করবে।

এই নতুন বিপ্লবে অংশ নিতে হলে বিশেষ এক ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে সেটি আমরা অনুভব করতে পারি। যদি আমরা বেঁচে থাকার সুনির্দিষ্ট দক্ষতাপুলো দেখতে চাই তাহলে সেগুলো হবে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা, সূচনাত্মকত্ব, সময়সীমা সমাধানে পারদর্শী, বিশ্লেষণী চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking), সৃজনশীলতা এবং তার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা।



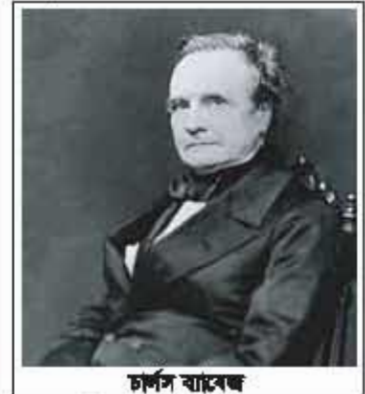
আইসিটি প্রতিবেশিত

সত্যি কথা বলতে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা (Skill) হিসেবে খুব সূত্র স্থানকরে নিচ্ছে। একুশ শতকে টিকে থাকতে হলে সবাইকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে। এই প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা থাকলেই একজন এটি ব্যবহার করে তার বিশাল বৈচিত্র্যের জগতে প্রবেশ করতে পারে। একজন শিক্ষার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত না হবে—ততক্ষণ পর্যন্ত সে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংযোজন, মূল্যায়ন করে নতুন তথ্য সৃষ্টি করতে পারবে না। এই দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে সে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে স্থান করে নিতে পারবে না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে উদ্ভেদযোগ্য ব্যক্তিত্ব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আজকের বিকাশের পেছনে রয়েছে অনেক বিজ্ঞানী, স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রকৌশলী এবং নির্মাতাদের অবদান। তার এবং তারহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটারের গণনা ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মাইক্রোইলেকট্রনিক্সের বিকাশ বর্তমানে আইসিটিকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছে।

আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ বা প্রচলন শুরু হয় চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) [১৭৯১-১৮৭১] নামে একজন ইংরেজ প্রকৌশলী ও গণিতবিদের হাতে। অনেকে তাঁকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলে থাকেন। তিনি তৈরি করেন ডিকারেন্স ইঞ্জিন। ১৯৯১ সালে লন্ডনের বিজ্ঞান জাদুঘরে চার্লস ব্যাবেজের বর্ণনা অনুসারে একটি ইঞ্জিন তৈরি করা হয়। দেখা যায় যে, সেটি সঠিকভাবেই কাজ করেছে এবং পরবর্তীতে তিনি এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে একটি গণনা যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন।



চার্লস ব্যাবেজ



আডা লাভলেস

তবে গণনার কাজটি কীভাবে আরো কার্যকর করা যায় সেটি নিয়ে ভেবেছিলেন কবি লর্ড বায়রনের কন্যা অ্যাডা লাভলেস (Ada Lovelace) (১৮১৫-১৮৫২)। মায়ের কারণে অ্যাডা ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের সঙ্গে তার পরিচয় হলে তিনি চার্লস ব্যাবেজের এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কাজে লাগানোর জন্য 'প্রোগ্রামিং'-এর ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। এ কারণে অ্যাডা লাভলেসকে প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক হিসেবে সম্মানিত করা হয়। ১৮৪২ সালে চার্লস ব্যাবেজ তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ইঞ্জিন সম্পর্কে বক্তব্য দেন। সে সময় অ্যাডা লাভলেস চার্লস ব্যাবেজের সহায়তা নিয়ে বক্তব্যের সঙ্গে ইঞ্জিনের কাজের ধারাটি খাপ অনুসারে ক্রমাক্ষিত করেন। তাঁর মৃত্যুর ১০০ বছর পর ১৯৫৩ সালে সেই নোট আবারো প্রকাশিত হলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, অ্যাডা লাভলেস অ্যালগরিদম প্রোগ্রামিংয়ের ধারণাটাই প্রকাশ করেছিলেন।

তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা

বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell) (১৮৩১-১৮৭৯) তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা প্রকাশ করেন। তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা বিনা তারে বার্তা প্রেরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।



জগদীশ চন্দ্র বসু

বিনা তারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বার্তা প্রেরণে প্রথম সফল হন বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (Jagadish Chandra

Bose) (১৮৫৮-১৯৩৭)। ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র বসু অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য প্রেরণে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কার প্রকাশিত না হওয়ায় সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি।

বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে একই কাজ প্রথম প্রকাশিত হওয়ায় সার্বজনীন স্বীকৃতি

পান ইতালির বিজ্ঞানী গুগলিয়েলমো মার্কনি (Guglielmo Marconi) (১৮৭৪-১৯৩৭)।

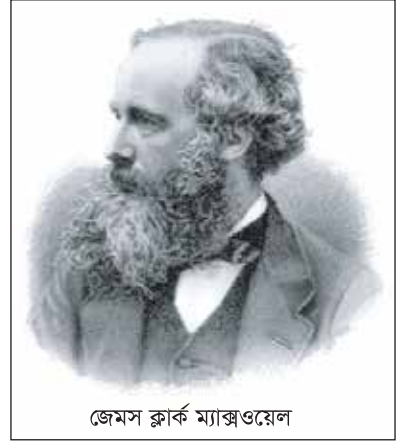
এ জন্য তাকে বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিশ শতকে ইলেকট্রনিক্সের বিকাশের পর প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের আইবিএম কোম্পানি মেইনফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করে। পর্যায়ক্রমে ১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হলে সাশ্রয়ী কম্পিউটার তৈরির পথ সুগম হয়।



রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন

বিশ শতকের ষাট-সত্তরের

দশকে ইন্টারনেট প্রটোকল (Internet Protocol) ব্যবহার করে আরপানেট (Arpanet) আবিষ্কৃত হয়। বলা যায়, তখন থেকে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিকশিত হতে শুরু করে। আর এ বিকাশের ফলে তৈরি হয় ইন্টারনেট। ১৯৭১ সালে আরপানেটে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পত্রালাপের সূচনা করেন আমেরিকার প্রোগ্রামার রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন (Ramond Samuel Tomlinson)। তিনিই প্রথম ই-মেইল পদ্ধতি চালু করেন।



জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

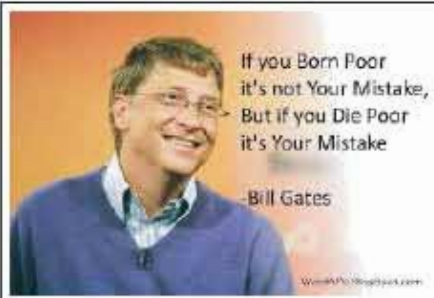


গুগলিয়েলমো মার্কনি



স্টিভ জবস

মাইক্রোপ্রসেসরের আবির্ভাবের পর বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্রে সেটি ব্যবহার করে পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরির কাজ শুরু হয়। স্টিভ জবস (Steve Jobs) (১৯৫৫-২০১১) ও তার দুই বন্ধু স্টিভ ওজানিয়াক (Steve Wozniak) ও রোনাল্ড ওয়েনে (Ronald Wayne) ১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল অ্যাপল কম্পিউটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। অ্যাপলের হাডেই পার্সোনাল কম্পিউটারের নানান পর্বীর বিকশিত হয়েছে।



উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস

অন্যদিকে ১৯৮১ সালে আইবিএম কোম্পানি তাদের বানানো পার্সোনাল কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করার জন্য উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস (William Henry Bill Gates) (জন্ম অক্টোবর ২৮, ১৯৫৫) ও তার বন্ধুদের প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটকে দায়িত্ব দেয়। বিকশিত হয় এমএস ডস এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম। বিল গেটস প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোসফট কোম্পানির অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার দিয়ে বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ কম্পিউটার পরিচালিত হয়।

১৯৮৯ সালে স্যার টিমোথি জন বার্নার্স-লি (Sir Timothy John Berners-Lee) (জন্ম জুন-৮, ১৯৫৫) একজন ব্রিটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী হাইপারটেক্সট ট্রান্সফর প্রটোকল (http) ব্যবহার করে তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। তিনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (www) জনক হিসেবে পরিচিত। নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বিশ্বের নানান দেশের মধ্যে ইন্টারনেট বিস্তৃত হয়। ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।



স্যার টিমোথি জন বার্নার্স-লি



মার্ক জুকরবার্গ

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম ফেসবুক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মার্ক জুকরবার্গ (Mark Zuckerberg) (জন্ম মে ১৪, ১৯৮৪) ও তার চার বন্ধুর হাতে সূচিত হয় ফেসবুকের। শুরুরে এটি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে অনেকেই ফেসবুক ব্যবহার করেন। এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। আমাদের বাংলাদেশের অনেকেই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক ব্যবহার করেন।

ই-লার্নিং ও বাংলাদেশ

পৃথিবীতে জ্ঞান অর্জনের একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দীর্ঘদিন থেকে মোটামুটি একইভাবে কাজ করে আসছিল। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি হওয়ার পর প্রথমবার সেই পদ্ধতির এক ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করেছে এবং ই-লার্নিং নামে নতুন কিছু শব্দের সাথে আমরা পরিচিত হতে শুরু করেছি। ই-লার্নিং শব্দটি ইলেকট্রনিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এটা বলতে আমরা পাঠদান করার জন্যে সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বুঝিয়ে থাকি। মনে রাখতে হবে ই-লার্নিং কিন্তু মোটেও সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদানের বিকল্প নয়, এটি সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক। উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলা যায়, শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞানের একটা বিষয় পড়ানোর সময় অনেক কিছুই হয়তো হাতে-কলমে দেখানো সম্ভব নয়। যেমন- সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি। শ্রেণিকক্ষে পাঠ দিতে দিতে শিক্ষক ইচ্ছে করলেই মাল্টিমিডিয়া সাহায্য নিয়ে আরও সুন্দরভাবে বিষয়টির দৃশ্যমান উপস্থাপন করতে পারেন। সেটি এমনকি Interactive-ও হতে পারে।

আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বিশাল। সে কারণে স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যাও বিশাল। নানা ধরনের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমাদের স্কুলগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। লেখাপড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বলতে গেলে নেই। ল্যাবরেটরি অপ্রতুল, ফলে হাতে-কলমে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ খুব কম। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যে ই-লার্নিং অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখতে পারে। দক্ষ একজন শিক্ষকের পাঠদান ভিডিও করে নিয়ে সেটি অসংখ্য স্কুলে বিতরণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বোঝানোর জন্যে অনেক ধরনের সহায়ক প্রক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের দেয়া যেতে পারে। একজন শিক্ষক চাইলে নিজেই তার পাঠদানে সহায়তা করার জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয় তৈরি করতে পারেন এবং সেটি বারবার ব্যবহার করতে পারেন। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষকই এটি ব্যবহার করছেন।

সারা পৃথিবীতেই ই-লার্নিংয়ের জন্যে নানা উপকরণ তৈরি হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বড় বড় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য কোর্স অনলাইনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং যে কেউ সেই কোর্সটি গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে এবং অনেক সময়েই একজন সেই কোর্সটি নেয়ার পর তার হোমওয়ার্ক জমা দিয়ে কিংবা অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে সেই কোর্সটির প্রয়োজনীয় ক্রেডিট পর্যন্ত অর্জন করতে পারছে।

আমাদের বাংলাদেশও এতে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা এ ধরনের বেশ কিছু ওয়েব পোর্টাল তৈরি করেছেন এবং সারা পৃথিবী থেকে যে কেউ বাংলা ভাষায় সেই কোর্সগুলো গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার উপযোগী এই ধরনের সাইটগুলো দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আমাদের দেশে উত্তম পাঠদানের সীমাবদ্ধতা দূর করার ব্যাপারে ই-লার্নিং অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারলেও আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, এটি কিন্তু কোনোভাবেই প্রচলিত পাঠদানের বিকল্প নয়। প্রচলিত পাঠদানের সময় একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের সরাসরি দেখতে পারেন, তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে নানাভাবে ভাব বিনিময় করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে। শুধু তাই নয়, তারা পাশাপাশি একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে, একে অন্যের সহযোগী হয়ে শিখতে পারে। ই-লার্নিংয়ের বেলায়

এই বিষয়গুলো প্রায় সময়ই অনুপস্থিত থাকে, পুরো প্রক্রিয়ায় মানবিক অংশটুকু না থাকায় পদ্ধতিটা যান্ত্রিক বলে মনে হতে পারে। সে কারণে ই-লার্নিংকে সফল করতে হলে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি উদ্যোগী হতে হয়।

আমাদের বাংলাদেশে ই-লার্নিংয়ের অনেক বড় সুযোগ আছে, কারণ অনেক বড় বড় সীমাবদ্ধতা আসলে ই-লার্নিং ব্যবহার করে সমাধান করে ফেলা সম্ভব। তবে প্রচলিত ই-লার্নিংয়ের জন্যে ইন্টারনেটের স্পিড, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ই-লার্নিংয়ের শিখনসামগ্রী (Materials) তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সরকার গুরুত্বের সাথে এ ধরনের শিখনসামগ্রী তৈরি করছে। এতে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হবে।

দলগত কাজ

শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে ই-লার্নিং কী ভূমিকা রাখতে পারে দলে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

ই-গভর্ন্যান্স ও বাংলাদেশ

গুড গভর্ন্যান্স বা সুশাসনের জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা। ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং দেশে সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স।

একটা সময় ছিল যখন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা ছিল পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য এক বিড়ম্বনার ব্যাপার। বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামে অবস্থানরতদের পক্ষে এটি ছিল দুষ্কর। মাত্র দুই-দশক আগেও এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সাত দিন পরেও অনেকেই তাদের ফলাফল জানতে পারত না। কিন্তু বর্তমানে ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানা যায়। ফলে, ফলাফল জানার যে বিড়ম্বনা ছিল সেটির অবসান হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের আর একটি উদাহরণ হলো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য মোবাইল ফোনে আবেদন করার সুবিধা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পূর্বে যশোর জেলায় একজন শিক্ষার্থী সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হলে তাকে অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হতো। এজন্য নিজে অথবা প্রতিনিধিকে সিলেট গিয়ে একবার ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং পরে আবার আবেদনপত্র জমা দিতে হতো। বর্তমানে মোবাইল ফোনেই এই আবেদন করা যায়। ফলে, ভর্তিচ্ছুদের ভর্তির আবেদন ফরম জোগাড় ও জমা দেওয়ায় জন্য শহর থেকে শহরে ঘুরতে হয় না।

আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল সেবা স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং বামেলাহীনভাবে পাওয়ার জন্য চালু হয়েছে জেলা ই-সেবা কেন্দ্র। এর ফলে আগে যেখানে কোনো সেবা পেতে ২/৩ সপ্তাহ লাগতো, সেটি এখন মাত্র ২-৫ দিনে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় কম লাগছে। সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দলিল, পর্চা প্রভৃতির নকল প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক যন্ত্রণার আর একটি উদাহরণ হলো পরিসেবাসমূহের বিল পরিশোধ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির বিল পরিশোধের গতানুগতিক পদ্ধতি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং যন্ত্রণাদায়ক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ কর্মময় দিন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধেই নাগরিককে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোন কিংবা অনলাইনে এই বিল পরিশোধ করা যায়। কেবল বিদ্যুৎ নয়, পানি ও গ্যাসের বিলও এখন অনলাইনে ও মোবাইল ফোনে পরিশোধ করা যায়। গভর্ন্যান্সের মূল বিষয় হলো নাগরিকের জীবনমান উন্নত করা এবং হয়রানিমুক্ত রাখা। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে

কোনো কোনো কার্যক্রম ৩৬৫ দিনের ২৪ ঘণ্টা করা সম্ভব যেমন- ATM সেবা, Mobile ব্যাংকিং, তথ্য সেবা ইত্যাদি। কলে, নাগরিকরা নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে।

অন্যদিকে ই-গভর্ন্যান্স চালুর ফলে সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মীদের দক্ষতাও বেড়েছে। ফলে দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্স চালু হয়েছে বেশ কয়েক বছর হয়েছে। এখনো কিছু ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু হওয়ার বাকি রয়েছে। সকল ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু হলে সুশাসনের পথে দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।

ই-সার্ভিস ও বাংলাদেশ

সরকারি এবং বেসরকারি অনেক সেবামূলক সংস্থা সার্বক্ষণিকভাবে অথবা সময়ে সময়ে দেশের জনগণকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। এই সেবা হতে পারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত কিংবা কোনো জমির দলিলের নকল সরবরাহ করা। ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ার পূর্বে এই সকল সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাকে অবশ্যই সেবাদাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হতো। কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাগ্রহীতা নিজ বাড়িতে বসেই মোবাইল ফোনে বা ইন্টারনেটে একই সেবা গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য কোনো আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেট সংগ্রহের কথা বিবেচনা করা যায়। কিছুদিন পূর্বেও এই টিকেট সংগ্রহের জন্য যাত্রী নিজে অথবা তার কোনো লোকের ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে টিকেট সংগ্রহ করতে হতো। এই পদ্ধতি এখনও বহাল আছে। তবে, এর পাশাপাশি এখন যে কেউ অনলাইনে টিকেট সংগ্রহ করতে পারে। অনলাইনেই টিকেটের মূল্য পরিশোধ করা যায়। এভাবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের ব্যাপারটি ই-সার্ভিস বা ই-সেবা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ই-সেবার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-এটি স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে এবং হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই অনেক ই-সেবা চালু হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল সংস্করণ, ই-পূর্জি, ই-পার্চা, ই-টিকেট, টেলিমেডিসিন, অনলাইন আয়কর হিসাব করার ক্যালকুলেটর ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ই-সেবা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক. ই-পূর্জি : দেশের প্রথম দিককার ই-সেবাসমূহের একটি। দেশের ১৫টি চিনিকলের সকল আখচাষি এখন এসএমএসের মাধ্যমে পূর্জি তথ্য পাচ্ছে। পূর্জি হচ্ছে চিনিকলসমূহে কখন আখ সরবরাহ করতে হবে সে জন্য আন্তর্জাতিক আখচাষিদের দেওয়া একটি অনুমতিপত্র। এসএমএসের মাধ্যমে আখচাষিরা তাত্ক্ষণিকভাবে পূর্জির তথ্য পাচ্ছে বলে এখন তাদের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান হয়েছে। পাশাপাশি সময়মতো আখের সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ার চিনিকলের উৎপাদনও বেড়েছে।

খ. ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (ই-এমটিএস) : বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিরাপদে, দ্রুত ও কম খরচে টাকা পাঠানো যায়। ১ মিনিটের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায়। দেশের প্রায় সকল ডাকঘরে এই সেবা পাওয়া যায়।

The image shows a sample of a Bangladesh Government ID card (NID). It includes fields for Name, Date of Birth, Sex, and a list of authorized users. The card is issued by the Bangladesh Government.

Field	Value
Name	ABU BAKAR
Date of Birth	10/10/1980
Sex	Male
Authorized Users	1. ABU BAKAR (10/10/1980) 2. ABU BAKAR (10/10/1980) 3. ABU BAKAR (10/10/1980) 4. ABU BAKAR (10/10/1980) 5. ABU BAKAR (10/10/1980) 6. ABU BAKAR (10/10/1980) 7. ABU BAKAR (10/10/1980) 8. ABU BAKAR (10/10/1980) 9. ABU BAKAR (10/10/1980) 10. ABU BAKAR (10/10/1980)

- গ. **ই-পার্চা সেবা** : বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করা যায়। এটিকে বলা হয় ই-পার্চা। পূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীগণ বড় বড় রেকর্ড বই থেকে তথ্যসমূহ পূর্ব নির্ধারিত ছকে পূরণ করে আবেদনকারীকে সরবরাহ করতেন। এজন্য আবেদনকারীকে যেমন সরাসরি উপস্থিত হতে হতো তেমনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরাও গতানুগতিক পদ্ধতিতে পার্চা তৈরি করতেন। বর্তমানে এটি ই-সেবার আওতায় আসতে আবেদনকারী দেশ-বিদেশের যেকোনো স্থান থেকেই নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে পার্চা সংগ্রহ করতে পারেন।
- ঘ. **ই-স্বাস্থ্যসেবা** : বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকরা এখন মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। দেশের যেকোনো নাগরিক এভাবে যেকোনো চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন। এছাড়া দেশের কয়েকটি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে রোগী হাসপাতালে না এসেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ পাচ্ছেন।
- ঙ. **রেলওয়ের ই-টিকেটিং ও মোবাইল টিকেটিং** : বাংলাদেশ রেলওয়ের কয়েকটি আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেট এখন মোবাইল ফোনেও ক্রয় করা যায়। আবার অনলাইনেও টিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে, নিজের সুবিধামতো সময়ে রেলস্টেশনে না গিয়েও নির্দিষ্ট গন্তব্যের টিকেট সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে। মোবাইল ফোন বা অনলাইনে টিকেট সংগ্রহ করা হলে ট্রেন ছাড়ার অল্প সময় পূর্বে যাত্রীকে স্টেশনে যেতে হয় এবং মোবাইল ফোন বা অনলাইনে প্রাপ্ত গোপন নম্বর প্রদর্শন করে সেখানে নির্ধারিত কাউন্টার থেকে যাত্রার টিকেট সংগ্রহ করে নিতে হয়।

ই-কমার্স ও বাংলাদেশ

একটি দেশের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের কোনো বিকল্প নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ, ইন্টারনেটের উদ্ভব ও বিকাশ এবং কাগজের মুদ্রার বাইরেও ইলেকট্রনিক বিনিময় প্রথা চালু হওয়ার ফলে বাণিজ্যেরও একটি বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। এখন ইলেকট্রনিক মাধ্যমেও বাণিজ্য করা যায়, যার প্রচলিত নাম ই-কমার্স বা ই-বাণিজ্য।

যেকোনো পণ্য বা সেবা বাণিজ্যের কয়েকটি শর্ত থাকে। প্রথমত বিক্রেতার কাছে পণ্য থাকা। দ্বিতীয়ত ক্রেতা কর্তৃক তার বিনিময় মূল্য পরিশোধ করা। এর প্রধান পদ্ধতি হলো বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ছবি, ভিডিও দিয়ে ইন্টারনেটেই তার 'দোকান'টি খুলে বসতে পারেন। এজন্য তার প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট চালু করতে হয়। ক্রেতা অনলাইনে তার পছন্দের পণ্যটি পছন্দ করেন এবং মূল্য পরিশোধ করেন। দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই মূল্য পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও মূল্য পরিশোধ করা যায়। তৃতীয়ত মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রেতা তার পণ্যটি ক্রেতার ঠিকানায় নিজে অথবা পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (কুরিয়ার সার্ভিস) মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন।

মোবাইল বা কার্ড ছাড়াও ই-কমার্সে আরো একটি বিল পরিশোধ পদ্ধতি রয়েছে। এটিকে বলা হয় প্রাপ্তির পর পরিশোধ বা ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD)। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রেতার ওয়েবসাইটে বসে পছন্দের পণ্যটির অর্ডার দেন। বিক্রেতা তখন পণ্যটি ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেন। ক্রেতা পণ্য পেয়ে বিল পরিশোধ করেন।

২০১১-১২ সাল থেকে বাংলাদেশেও আস্তে আস্তে ই-কমার্সের প্রসার হচ্ছে। বর্তমানে বই থেকে শুরু করে জামা, কাপড়, খাবার, শৌখিনসামগ্রী ইত্যাদি ই-কমার্সের মাধ্যমে বেচাকেনা হচ্ছে। প্রচলিত বাণিজ্যের মতো ই-কমার্সেও দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়। এক ধরনের প্রতিষ্ঠান কেবল নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে থাকে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয় করে। তোমরা ইতোমধ্যে ওয়েবসাইট, টিভি বা পত্র-পত্রিকায় এধরনের অনেক ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন দেখে ফেলেছ।

বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে আইসিটি

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এখন কর্মক্ষেত্রে আইসিটির বহুমুখী প্রভাব ও ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রভাব ও পরিসর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আইসিটির দুই ধরনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রথমত প্রচলিত কর্মক্ষেত্রগুলোতে আইসিটির প্রয়োগের ফলে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণ, অন্যদিকে আইসিটি নিজেই নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে।

প্রচলিত কর্মক্ষেত্র এবং পুরাতন ব্যবসা-বাণিজ্যে আইসিটি ব্যবহারের ফলে কর্মীদের দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বেড়েছে। অন্যদিকে এর ফলে সেবার মানও উন্নত হয়েছে। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের সাধারণ দক্ষতা একটি প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়। ব্যাংক, বিমা থেকে শুরু করে বহুজাতিক কোম্পানি, সরকারি দপ্তরে কাজ করার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসর থেকে উপস্থাপনা সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ব্রাউজিং থেকে ই-মেইল, নানান ধরনের বিশ্লেষণী সফটওয়্যার ইত্যাদিতে দক্ষ হতে হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষায়িত সফটওয়্যার (যেমন: ব্যাংকিং সফটওয়্যার) ব্যবহারেও পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়।

অন্যদিকে আইসিটি নিজেই একটি বড় আকারের কর্মবাজার সৃষ্টি করেছে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার থেকে শুরু করে ওয়েবসাইট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি এখন নতুন দক্ষ কর্মীদের জন্য একটি বিরাট কর্মক্ষেত্র। কেবল দেশে নয়, আইসিটিতে দক্ষ কর্মীরা দেশের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠানে অথবা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে। এই কাজের একটি বড় অংশ দেশে বসেই সম্পন্ন করা যায়। আউটসোর্সিং করে এখন অনেকেই বাংলাদেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

সামাজিক যোগাযোগ ও আইসিটি

মানুষ সমাজবান্দ জীব। সমাজে চলাফেরা ও বিকাশের জন্য মানুষে মানুষে যোগাযোগের প্রয়োজন। তবে এখন আইসিটিতে সামাজিক যোগাযোগ বলতে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়াকেই বোঝায়। এর অর্থ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যোগাযোগ ও ভাব প্রকাশের জন্য যা কিছু সৃষ্টি, বিনিময় কিংবা আদান-প্রদান করে তাই সামাজিক যোগাযোগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে এই যোগাযোগ হয়ে পড়েছে সহজ, সাশ্রয়ী এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ। ইন্টারনেটের ব্যবহার, ই-মেইল, মোবাইল ফোন ও মেসেজিং সিস্টেম, ব্লগিং এবং সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মসমূহ ব্যবহার করে বর্তমানে আইসিটিভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ অনেকাংশে সহজ।

ইন্টারনেটে গড়ে উঠেছে অনেক প্ল্যাটফর্ম, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটি মাধ্যম হলো-ফেসবুক ও টুইটার।

- **ফেসবুক (www.facebook.com) :** ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি ওয়েবসাইট। ২০০৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মার্ক জুকারবার্গ তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এটি চালু করেন। বিনামূল্যে যে কেউ ফেসবুকের সদস্য হতে পারে। ব্যবহারকারীগণ বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি প্রকাশ, আদান-প্রদান ও হালনাগাদ করতে পারেন। এছাড়া এতে অডিও ও ভিডিও প্রকাশ করা যায়। ফেসবুকে যেকোনো প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পেজ যেমন খুলতে পারে, তেমনই সমমনা বন্ধুরা মিলে চালু করতে পারে কোনো গ্রুপ। www.statista.com এর রিপোর্ট জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০১৮ অনুযায়ী বিশ্বে facebook ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২.৭ বিলিয়ন।
- **টুইটার (www.twitter.com) :** টুইটারও একটি সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে ফেসবুকের সঙ্গে এর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এটিতে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ ১৪০ Character-এর মধ্যে তাদের মনোভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে হয়। এজন্য এটিকে মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইটও বলা যায়। ১৪০ অক্ষরের এই বার্তাকে বলা হয় টুইট (tweet)। টুইটারের সদস্যদের টুইট বার্তাগুলো তাদের প্রোফাইল পাতায় দেখা যায়। টুইটারের সদস্যরা অন্য সদস্যদের টুইট পড়ার জন্য সে সদস্যকে অনুসরণ বা follow করতে পারেন। কোনো সদস্যকে যারা অনুসরণ করে তাদেরকে বলা হয় follower বা অনুসারী।

বিনোদন ও আইসিটি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে বিনোদনের জগতে একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এটি ঘটেছে দুইভাবে। প্রথমত, বিনোদনটি কীভাবে মানুষ গ্রহণ করবে সেই প্রক্রিয়াটিতে একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমগুলোতে একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

দেখা যাক বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনটি কীভাবে ঘটেছে। একটা সময় ছিল যখন বিনোদনের জন্য মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে হতো। সিনেমা দেখতে হলে সিনেমা হলে যেতে হতো, খেলা দেখতে হলে খেলার মাঠে যেতে হতো, গান শুনতে হলে গানের জলসায় যেতে হতো। এখন এধরনের বিনোদনের জন্যে মানুষের আর ঘর থেকে বের হতে হয় না। প্রথমে রেডিও, তারপর টেলিভিশন এসেছে। তারপর এসেছে কম্পিউটার। একসময় কম্পিউটার সংযুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটের সাথে। আমরা আবিষ্কার করেছি একজন মানুষ চার দেওয়ালের ভেতরে আবদ্ধ থেকেই পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের বিনোদন উপভোগ করতে পারে। প্রথম যখন কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছিল তখন তার মূল কাজ ছিল কমপিউট বা হিসাব করা, শুধু বড় বড় প্রতিষ্ঠান বা সরকার একটা কম্পিউটারের মালিক হতে পারত। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে কম্পিউটার সহজলভ্য হয়ে এসেছে এবং একসময় মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্যে কম্পিউটার ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কম্পিউটার যখন শক্তিশালী হয়েছে তখন এটি শুধু লেখালেখি বা হিসাব-নিকাশের জন্যে ব্যবহৃত না হয়ে ধীরে ধীরে বিনোদনের জন্যে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখন সাধারণ মানুষ কম্পিউটারকে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে বিনোদনের জন্যে। গান, চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র সবকিছুই এখন কম্পিউটার দিয়ে করা যায়। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়াটিতে যেরকম পরিবর্তন এসেছে ঠিক সেরকম পরিবর্তন এসেছে বিনোদনের বিষয়গুলোতে। সজ্জীতকে ডিজিটাল রূপ দেওয়ায় এখন আমরা কম্পিউটারে গান শুনতে পারি। ঠিক একইভাবে আমরা ভিডিও বা চলচ্চিত্র দেখতে পারি। সিডি রম কিংবা ডিভিডি বের

হওয়ার পর সেখানে বিশাল পরিমাণের তথ্য রাখা সম্ভবপর হয়েছে। সিনেমা হলে না গিয়ে ঘরে বসে কম্পিউটার কিংবা টেলিভিশনে ডিভিডি থেকে চলচ্চিত্র দেখা এখন খুবই সাধারণ একটা বিষয়। ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বসানোর পর দ্রুতগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য হতে শুরু করেছে। কাজেই এখন একজনকে আর গান শোনার জন্যে কিংবা চলচ্চিত্র দেখার জন্যে অডিও সিডি বা ডিভিডির উপর নির্ভর করতে হয় না। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি গান বা চলচ্চিত্র উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয় রেডিও বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে শোনা ও দেখা যায় এবং সেগুলো অনেক সময়েই রেকর্ড করা থাকে বলে কাউকেই আর কোনো কিছুর জন্যে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয় না, যখন যেটি দেখার ইচ্ছে করে তখনই সেটা দেখতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি উন্নত হবার পর নতুন কিছু বিনোদনের জন্ম হয়েছে যেটি আগে উপভোগ করা সম্ভব ছিল না, তার একটি হচ্ছে কম্পিউটার গেম। সারা পৃথিবীতেই এখন কম্পিউটার গেমের বিশাল শিল্প তৈরি হয়েছে এবং নানা ধরনের কম্পিউটার গেমের জন্ম হয়েছে। কম্পিউটার গেমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখেই আমরা আন্দাজ করতে পারি এটি বিনোদনের অত্যন্ত সফল একটি মাধ্যম। এর সাফল্যের প্রধান একটি কারণ হচ্ছে এটি ছোট শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন মানুষ সবাইকেই তার নিজের বুচি মাফিক আনন্দ দিতে পারে। একজন আরেক জনের সাথে কম্পিউটার গেম খেলতে পারে, কম্পিউটারের সাথে খেলতে পারে এমনকি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বাইরের কারো সাথেও খেলতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রেই এই বিনোদন উপভোগের তীব্রতা এত বেশি হতে পারে যে, সেটি এক ধরনের আসক্তির জন্ম দিতে পারে এবং সে কারণে কম্পিউটার গেম উপভোগ করার ব্যাপারে সারা পৃথিবীতেই সবাইকে সতর্ক থাকার কথা বলা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিনোদন সৃষ্টির ব্যাপারেও এক ধরনের বড় ভূমিকা রেখেছে। অ্যানিমেশন বা কার্টুন তৈরি করা এক সময় অনেক কঠিন একটা বিষয় ছিল। তথ্যপ্রযুক্তি এবং শক্তিশালী কম্পিউটারের কারণে এখন এটি অনেক সহজ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সৃষ্টিশীল মানুষের সৃজনশীলতার কারণে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। সত্যিকারের অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়াই গ্রাফিক্স নির্ভর চলচ্চিত্রের ডিজিটাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জন্ম হতে শুরু করেছে। বিখ্যাত ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রে কাল্পনিক প্রাণী ডাইনোসর কিংবা ভিন্ন জগতের প্রাণী তৈরি করার জন্যে শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবহার করা এখন অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয়।

এক কথায় আমরা বলতে পারি, তথ্যপ্রযুক্তির কারণে শুধু যে নতুন নতুন বিনোদনের জন্ম নিচ্ছে তা নয়, সেই বিনোদনগুলো এখন একেবারে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা এটি মাত্র শুরুর, ভবিষ্যতে আইসিটি নির্ভর বিনোদন কোন পর্যায়ে যাবে সেটি কল্পনা করাও অসম্ভব!

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বর্তমান সরকার প্রথমবারের মতো ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে ১৯৭১ সালে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি, ২০২১ সালে তার অর্শতাদী পূর্ণ হবে এবং সে কারণে এই সময়ের ভেতরে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি বিশেষ জায়গায় নেওয়ার একটি স্বপ্ন আমাদের সবাইকে স্পর্শ করেছিল। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ কথাটি শুধু একটি কথা হয়ে থাকেনি। এটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে এই দেশের সরকার এবং সাধারণ মানুষ সবাই একটি বড় উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রথমেই আমাদের জানা দরকার এনালগ ও ডিজিটাল কথাটি দিয়ে আমরা কী বোঝাই। পরিবর্তনশীল (বিচ্ছিন্ন) ডাটাকে যখন সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে এনালগ সংকেত বলে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দৈনন্দিন তাপমাত্রার কথা ধরা যাক, দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের তাপমাত্রা অনুভূত হয়। এই অনুভূত তাপমাত্রাকে যখন সংকেতরূপে প্রকাশ করি তখন তাকে এনালগ সংকেত বলি।



ক. এনালগ



এনালগ সংকেতের সাহায্যে আমরা নির্ভুল এবং সূক্ষ্ম তথ্য পাই না, প্রাপ্ত মানের তারতম্য থাকে। এই এনালগ সংকেতকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দুইটি অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, এই অবস্থাগুলোকে অঙ্কের (Digit) মাধ্যমে প্রকাশ করার

23:59:59

খ. ডিজিটাল



ফলে এনালগ সংকেতের তুলনায় আরও নির্ভুল এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তথ্য পাওয়া যায়। Digit এর মাধ্যমে সংকেত প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত এই ধরনের সংকেতকে ডিজিটাল সংকেত বলা হয়। যেমন: ঘর, কাঁটামুক্ত ঘড়ি এনালগ সংকেত প্রদর্শন করে, পক্ষান্তরে কাঁটাবিহীন ঘড়ি ডিজিটাল সংকেত প্রদর্শন করে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ কথাটি শুধু একটি 'কম্পিউটার প্রস্তুত দেশ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। এটি আরও অনেক ব্যাপক। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আসলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা আধুনিক বাংলাদেশ বোঝানো হয়। সব ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য মোচনের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে আমাদের পুরাতন মানসিকতার পরিবর্তন করে ইতিবাচক বাস্তবতা এবং উন্মাবনী চিন্তা করা খুব জরুরি। ডিজিটাল বাংলাদেশের পেছনের মূল কথাটি হচ্ছে দেশের মানুষের জন্যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সুবিচার নিশ্চিত করা এবং সেগুলোর জন্যে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সকল শ্রেণির সব ধরনের মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের বাস্তবায়নের জন্যে সরকার চারটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে; সেগুলো হচ্ছে— মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনগণের সম্পৃক্ততা, সিভিল সার্ভিস এবং দৈনন্দিন জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার।

পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কাজটি শুরু করেছে দেরিতে। তাই অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। অতীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি না করলেও বর্তমানে এটি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হওয়ায় আমাদের দেশে এখন দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

প্রযুক্তি প্রসারের একটি সুন্দর দিক রয়েছে, কোনো দেশ বা জাতির একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকলে সব সময়েই তাদের পিছিয়ে থাকতে হয় না। বড় বড় লাফ দিয়ে (Leap Frog) অন্যদের ধরে ফেলা যায়। তাই বাংলাদেশ তার সর্বশক্তি দিয়ে সামনে এগিয়ে অন্য দেশের সমান হবার চেষ্টা করছে।

সরকারের আগ্রহের কারণে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সারা দেশে ফাইবার অপটিক লাইন বসিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাত্র এক-দেড় দশক আগেও এদেশে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এখন নির্দিষ্ট বলা যায় এই দেশের প্রত্যেকটি

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হাতের নাগালে ফোন রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার খোলা হয়েছে, প্রত্যন্ত এলাকায় পোস্ট অফিসগুলোকে ই-সেন্টারে রূপান্তরিত করে মোবাইল মানি অর্ডারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টারের সাথে সাথে ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সেল এবং ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেল দেশের অবকাঠামোতে একটা বড় সংযোজন। মোবাইল টেলিফোন দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল জানা কিংবা ট্রেনের টিকেট কেনার মতো কাজগুলো নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। স্কুল-কলেজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পাঠ সংযোজন করা হয়েছে— এই বইটি তার প্রমাণ। দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ানো হচ্ছে। দেশের তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেরা কোম্পানি গড়ে তুলছে এবং বিশাল সংখ্যক তরুণ-তরুণী ব্যক্তিগত পর্যায়ে আউটসোর্সিং করে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করছে।

২০১৮ সালের ১২ই মে তারিখটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদিনে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম রাষ্ট্র হিসেবে তার নিজস্ব স্যাটেলাইট ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ মহাকাশে প্রেরণ করে। এতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। স্যাটেলাইটটি ব্যবহার করে শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, আবহাওয়ার পূর্বভাস নানা ক্ষেত্রে সুফল পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করবে। টেলিভিশন সেবা ও জাতীয় নিরাপত্তার কাজেও এ স্যাটেলাইটটি ব্যবহার করা যাবে। বাংলাদেশের যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ হবে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ও সম্ভব হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির এই সাফল্য শুনে কেউ যেন মনে না করে আমরা ইতোমধ্যে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি— এটি মোটেও সত্যি নয়। এই পথে আমাদের আরো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। যেহেতু আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই গ্রামে থাকে তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রথম ধাপ হচ্ছে এই গ্রামীণ মানুষকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবার আওতায় নিয়ে আসা। সেজন্য এখনো বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির পুরো সুবিধা পেতে হলে এক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান বাড়াতে হবে, আরো বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। ই-গভর্ন্যান্স এর মাধ্যমে সকল কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগাতে উৎসাহী করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। তাহলেই আমরা প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।

দলগত কাজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে করণীয় নিয়ে একটি পোস্টার ডিজাইন কর।

অনুশীলনী

১. লন্ডন বিজ্ঞান জাদুঘর যান্ত্রিকভাবে গণনা করতে সক্ষম ইঞ্জিন কত সালে তৈরি করে?

ক. ১৮৩৩	খ. ১৮৪২
গ. ১৯৫৩	ঘ. ১৯৯১
২. কোন আবিষ্কারকের আবিষ্কারের ফলে আজকের পৃথিবীতে ঘরে বসেই অফিসের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে?

ক. চার্লস ব্যাবেজ	খ. অ্যাডা লাভলেস
গ. জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল	ঘ. জগদীশ চন্দ্র বসু
৩. ফেসবুকের নির্মাতা কে?

ক. স্টিভ জবস	খ. বিল গেটস
গ. মার্ক জুকারবার্গ	ঘ. টিম বার্নার্স লি
৪. সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে-
 - i. স্বল্পসময়ে সরকারি সেবা পাওয়া যাবে
 - ii. সরকারি সেবার মান উন্নত হবে
 - iii. ছুটির দিনেও অনেক সরকারি সেবা পাওয়া যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সুমন সেন্টমার্টিন বেড়াতে যেয়ে অসুস্থ হয়ে গেলে ফোনে সে ঢাকায় একজন চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে। তিনি সুমনকে দ্রুত হাসপাতালে যেতে বলেন। পরে হাসপাতালের ডাক্তার ঢাকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে সুমনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

৫. স্থানীয় ডাক্তার যে পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন তা হলো-

- i. টেলিমেডিসিন সেবা
- ii. ই-স্বাস্থ্যসেবা
- iii. ই-কমার্স সেবা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৬. সুমনের চিকিৎসায় কোন প্রযুক্তিটির ভূমিকা প্রধান?

- | | |
|-----------|--------------|
| ক. আইসিটি | খ. টেলিভিশন |
| গ. রোবট | ঘ. কম্পিউটার |

৭. কুড়িগ্রামের রৌমারি উপজেলার যাদুর চর গ্রামের মিলন গ্রামে বসেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে তাকে সাহায্য করতে পারে?

৮. বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূর করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী কী সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে? বর্ণনা কর।